অভিসরণ / ABHISARON
A Multilingual International Peer-Reviewed Research Journal
Volume 1, Issue II, July 2026, PP. 196-202
www.abhisaron.com
ISSN-3139-4027(Online)
DOI - https://dx.doi.org/10.67757/abhisaron.2026.v1i2.028

ANIL GHARAI ER NIRBACHITA GALPA / অনিল ঘড়াই এর নির্বাচিত গল্প : সমাজ চিত্রের দর্পণে

KARTIK CHANDRA PAL/কার্ত্তিক চন্দ্র পাল
গবেষক, বাংলা বিভাগ, মেদিনীপুর কলেজ (স্বশাসিত)
Email: kartikpal784@gmail.com

Accepted: 07.07.2026
Published: 20.07.2026

Keywords:
শাসন, অপত্য স্নেহ,উগ্র রাজনীতি, পতিপ্রেম, নিম্নবিত্ত শ্রেণী, দলিত শ্রেনী, শ্রমজীবি, প্রতিকূলতা, সতীত্ব, সামাজিক ব্যাধি, অর্থনৈতিক সংকট, আত্মমর্যাদাবোধ, মনুষ্যত্ব, নরপিশাচ, ক্ষুধার্ত, প্রগতিশীলসমাজ

Abstract:

বাংলা সাহিত্যে বিশিষ্ট আধুনিক কথাকার হলেন অনিল ঘড়াই। তাঁর জীবন (১৯৫৭-২০১৪) সময়কাল। সমাজ সচেতন কথাশিল্পী অনিল ঘড়াই এর সৃষ্টিতে উঠে এসেছে সাধারণ শ্রমজীবী মানুষের সংগ্রাম করে বেঁচে থাকার ইতিহাস। তাঁর লেখনীতে কখনো দেখা যায় দলিত শ্রেণীর জীবনসংগ্রাম,আবার কখনো দেখা যায় সাধারণ নিম্ন বিত্ত মানুষের বেঁচে থাকার আর্ত চিৎকার। আসলে তিনি যে সময়ের সাহিত্যিক ছিলেন সেই সময় উদ্বাস্তু সমস্যা,দেশভাগের যন্ত্রণা,শ্রমিক মালিকের বিবাদ,সাম্রাজ্যবাদী শক্তির শোষণ শাসন,রাষ্ট্রশক্তির শাসন প্রভৃতির নাগপাশে সাধারন মানুষ নিষ্পেষিত,অত্যাচারিত এবং অস্তিত্ব বিপন্নের সম্মুখীন। তিনি তাঁর একাধিক রচনায় বিশেষ করে গল্পে সাধারণ শ্রমজীবী মানুষের অসহায়তা,গৃহস্থ-পারিবারিক কলহ,দারিদ্র্যের যন্ত্রণা সহ তিক্ত করুণ ছবি তুলে ধরেছেন। তিনি ছিলেন বাস্তববাদী কথাকার। তাই শুধু মানুষের মধ্যেকার সমস্যার ছবি তুলে ধরেননি, পাশাপাশি সমাধানের পথ প্রদর্শকের কাজ করেছেন। অর্থাৎ আমরা তাঁর গল্পে তিনটি বিষয় লক্ষ করি। গল্পের চরিত্র গুলির পারস্পরিক ঝগড়া,বিবাদ,নানা অসুবিধা এবং তার ভয়াবহতা। আর শেষে সেই ভয়াবহতা অতিক্রম করে জীবনে উত্তরণের পথ ও বেঁচে থাকার অভীপ্সা খুঁজে বের করেছিলেন। অনিল ঘড়াইয়ের গল্পগুলি শুধু গল্প নয়,সমাজের চলচ্ছবি। তাঁর গল্পে রয়েছে মাটির গন্ধ,রয়েছে আমাদের চারপাশেদের দেখা নাদেখা পরিচিত অপরিচিত নানা চরিত্র। মানুষ,প্রকৃতি ও নারী জীবনের নানা চলমান ছবিগুলিতে ঘুরে ফিরে এসেছে নানা অভিঘাতের মধ্য দিয়ে।

তাঁর গল্প শ্রমজীবি মানুষের কথা বলে। প্রজন্ম থেকে প্রজন্ম যারা শোষণ আর বৈষম্যের বাঘনখে ক্ষতবিক্ষত তাদের কথা বলে। গল্পাকার অনিল ঘড়াই তাঁর গল্পগুলিতে নরনারীর সাংসারিক দুঃখকে তুলে ধরার পাশাপাশি কোথাও সামাজিক,রাজনৈতিক আবার কোথাও ধর্মীয় বেড়াজাল,পাহাড়ী জনজীবন ও আদিবাসী সমাজের প্রতিচ্ছবি তুলে ধরেছেন। সহজ সরল ভাষা এবং কথন শৈলী,একাধিক চরিত্রের সংযোজন ও সাবলীল বর্ণনার মাধ্যমে গল্পাকারের এক অভিনব প্রতিভার পরিচয় পাওয়া যায়। এছাড়াও সমকালীন সাধারণ মানুষের বিশেষ করে শ্রমজীবী মানুষের কষ্ট শোষণ শাসনের ছবিকেউ গল্পকার সুন্দরভাবে অঙ্কিত করেছেন। আমার আলোচনায় অনিল ঘড়াই এর এমনই পঞ্চাশটি গল্প নিয়ে লেখা গ্রন্থের কিছু নির্বাচিত গল্পের কাহিনি,চরিত্র,বিষয় বিশ্লেষণের মাধ্যমে গল্পাকারের রচনায় আদর্শ,বিষয়,কথনশৈলী এবং সমকালীন সমাজ ও ইতিহাসের প্রতিচ্ছবির সম্মুখীন হব। গল্পগুলিতে মাটির মানুষের হৃদয়ের কান্না,তাদের আবেগ আশা আকাঙ্ক্ষা জীবনের গতিকে কিভাবে রুদ্ধ করেছে, সমকালীন সমাজের চিত্র আমরা দেখতে পাব। নিম্নে আলোচিত গল্পগুলিতে সমাজের একাধিক দিকের বর্ণনা লক্ষ করব। শ্রমজীবী মানুষের প্রতি গল্পকারের হৃদয় ব্যথিত হয়েছিল তা তার গল্পগুলি পড়লেই বুঝতে পারা যায়। আলোচ্য প্রবন্ধে কয়েকটি নির্বাচিত গল্পে সেই বিষয়ের বিশ্লেষণী দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে সমীক্ষায় অবতীর্ণ হয়েছি।

Discussion:

বিশিষ্ট কথা সাহিত্যিক বঙ্কিম পুরস্কার প্রাপ্ত অনিল ঘড়াই একাধিক রচনার মধ্যে অন্যতম গল্প সংকলন গ্রন্থ হল ‘সেরা পঞ্চাশটি গল্প’। সেই সংকলন গ্রন্থে নির্বাচিত কিছু অন্যতম গল্প যেমন ‘চৌকিদার’, ‘কালকেতু’, ‘ফেরা’, ‘পিণ্ডি’, ‘কাঠবাদামের ফুল’, এবং ‘উড়াঙ্গারা’। সেই সব গল্পের বিষয়,কাহিনী,চরিত্র বিশেষণ করার চেষ্টা করছি। তার অন্যতম একটি গল্প ‘চৌকিদার’। এই গল্পের অন্যতম চরিত্র সনাতন। সনাতন হলেন এক নিষ্ঠাবান, কর্তব্যবোধে সচেতন চৌকিদার। তার মত আদর্শবান চৌকিদারের জীবনে নানা উত্থান-পতন, হৃদয়বিদারক ঘটনা উপস্থাপনের মধ্য দিয়ে তৎকালীন সমাজের জমিদার,জোরদার,প্রভাবশালীর দ্বারা শারীরিক ও মানসিক ইতিহাসকে তুলে ধরে গল্পাকার সমকালীন সমাজ ব্যবস্থার বৈষম্যকে তুলে ধরেছেন। সনাতনের বিয়ের পর স্ত্রীর তিন বছরের সন্তানকে রেখে অন্যত্র চলে যাওয়া এবং পরে পুত্রের কলেজ জীবন থেকে সনাতনকে ছেড়ে শহরে থাকা,একদিকে সনাতনের দাম্পত্য জীবন ও অপত্য স্নেহ কোনটাই সুখের হয়নি। অন্যদিকে নিঃসন্তান বেনুবাবুর একমাত্র সম্বল প্রিয় কালো রংয়ের ষাঁড়। যেটিকে তিনি ঠাকুরের নামে দাগা দিয়ে গ্রামের মধ্যে ছেড়ে দিয়েছিলেন। সেই ষাঁড়টির বৈশিষ্ট্য ছিল গ্রামের সব অন্যায় অসৎ মানুষদের শাস্তি দেওয়া। এমত অবস্থায় গ্রামের প্রধান হলধর বাবুর মেয়ের হাত ভেঙ্গে দেওয়াই এবং গ্রামের কিছু অঘটন ঘটায় ষাঁড়টির আতঙ্কে গ্রামের মানুষ ব্যতিব্যস্ত হয়ে পড়ে। তাই হলধর বাবুরা ঠিক করে,ষাঁড়টিকে বেঁধে রেখে বল্লম দিয়ে শাস্তি দিতে বা হত্যা করতে। কিন্তু পুত্রস্নেহে সমতুল্য ষাঁড়টির করুন পরিণতিতে বেনুবাবু মর্মাহত হন এবং গ্রামের চৌকিদার সনাতনকে ষাঁড়টির উদ্ধার করার জন্য কাতর আবেদন জানায়। পরে ষাঁড়টিকে উদ্ধার করতে গিয়ে গভীর রাত্রিতে একদিকে অসুস্থ ষাঁড়টি মৃত্যুমুখে পতিত হয়ে প্রাণ হারান। অন্যদিকে উগ্র রাজনীতি করার অপরাধে তার পুত্র বিশুকে পুলিশ হত্যা করে নিমতলার কাছে ফেলে দিয়ে যায়। সনাতন স্তম্ভিত হয়ে যায়। একদিকে মৃত ষাঁড়টির প্রতি তার পুত্রস্নেহ রসে ব্যথিত অন্যদিকে নিজ পুত্রের মৃত্যুর করুন দৃশ্য সনাতনকে জীবনের কঠোর অবস্থার সম্মুখীন দাঁড় করিয়ে দেয়। সর্বস্ব হারিয়ে বেদনায় কেঁদে ওঠে। স্থির সিদ্ধান্ত নেয় দুই খানা মৃতদেহের মাঝখানে দাঁড়িয়ে লাঠি উঁচিয়ে থাকার,জাতে কাক শকুনের হাত থেকে রক্ষা করতে পারে। যেন মনে হয়, “সে নিজে মরবে কিন্তু দখল দেবে না লাশের।”[১]

.

অর্থাৎ সমাজের অসাম্য,বৈষম্য,শোষণ,পীড়নের হাত থেকে যেমন মানুষ রেহাই পায়নি,অন্যদিকে মনুষ্যেতর প্রাণীরও রক্ষা নেই এই সমাজে বেঁচে থাকার। গল্পাকার সুচারুভাবে 'চৌকিদার' গল্পের কাহিনীর মাধ্যমে সমাজে এক অসাম্যের বাস্তব রূপ তুলে ধরেছএর। সহজ সাবলীল কথন রীতির মাধ্যমে আলোচ্য গল্পের কাহিনী ও বিষয় বাস্তবতার মোড়কে এক অনন্য নজির সৃষ্টি করেছেন।

পরবর্তী গল্প 'কালকেতু'। এই গল্পের অন্যতম চরিত্র ফুল্লরা। ফুল্লরা তার জীবনের মর্মন্তুদ ঘটনাকে অঙ্কিত করে গল্পকার নারীজীবনের অসহায়তা,প্রতিকূলতা ও পুরুষতান্ত্রিক সমাজের এক নির্মম অত্যাচারের চিত্রকে ফুটিয়ে তুলেছেন। ফুল্লরার ছোটবেলায় পিতা মারা যায়। অল্প বয়সে পাগলা ব্রজেশ্বরের সাথে বিয়ে হয়। স্বামীর বাড়ি ছেড়ে চলে আসে ফুল্লরা কিছুদিন পর। অতঃপর নিজগ্রামে আশ্রয় নেয় কিন্তু সেইখানে এক ধূর্ত গোবিন্দ নামে এক ন্রপিশাচের চোখে পড়ে। সে বারবার নিজের অধীনে আনার চেষ্টা করে কিন্তু বারবার ব্যর্থ হয়। ফুল্লরার সততা,আত্মসম্মানবোধ এবং নির্ভীকতা সাথে মোকাবিলা করে। এইভাবে চলতে চলতে কিছুদিন পর নিজের স্বামী ব্রজেশ্বর ফুল্লরাকে নিয়ে যেতে শ্বশুরবাড়ি আসে। কিন্তু ফুল্লরার মায়ের নির্দেশে পাড়ার লোকের লাঠি আঘাতে অসুস্থ হয়ে হাসপাতালে ভর্তি হয় ব্রজেশ্বর। ব্রজেশ্বরের জন্য হৃদয় আবেগিত হয় ফুল্লরার। ব্রজেশ্বরের সাথে পরবর্তী জীবন থাকার আশায় ব্রজেশ্বরের সুস্থতা কামনা করে ফুল্লরা। আলোচ্য গল্পে ব্রজেশ্বরকে কালকেতুরূপে গল্পাকার দেখিয়েছেন। ব্রজেশ্বর মাতাল হলেও একসময় সে তার পত্নী ফুল্লরাকে সামাজিক স্বীকৃতি দিতে চেয়েছে। সারাজীবন একসাথে থাকার প্রস্তাব দিয়েছে।শুধু তাই নয়, সন্তান-সন্ততি হওয়ার জন্য সে বদ্যি বাড়ী থেকে ওষুধ আনিয়ে খেয়েছে এবং ফুল্লরার জন্য তাবিজ আনিয়েছে। আলোচ্য গল্পে ফুল্লরার জীবনের উত্থান-পতন,চড়াই-উৎরাই করে জীবন অতিবাহিত হয়েছে। ফুল্লরার প্রতীকে গল্পাকার এক পিতৃহীন বাড়ির কন্যার জীবনের যেসব প্রতিকূলতা আসতে পারে তাকে অতিক্রম করে কিভাবে সংগ্রামের মধ্য দিয়ে নিজেকে রক্ষা করতে হয়,তা দেখিয়েছেন। ফুল্লরার প্রতীকে গল্পাকার যেন গ্রাম বাংলার নিম্ন মধ্যবিত্ত পরিবারের এক নারীর অসহায়তা, সতীত্ব, গ্লানি জীবন সংগ্রামের কাহিনী যুক্ত সামাজিক ব্যাধিকে তুলে ধরেছেন। রক্তলোলুপ নরপিশাচ গোবিন্দ বিভিন্ন প্রলোভন দেখিয়ে কলঙ্কিত করার চেষ্টা করেছে। ফুল্লরা সাহসের সাথে,আত্মসম্মানের সাথে তার প্রতিবাদ করেছে এবং রুখে দাঁড়িয়ে মোক্ষম জবাব দিয়েছে। গল্পাকার দেখিয়েছেন সমাজে আজও অসহায় নারী যদি সাহসী হয়, সতীত্ববান হয়, আত্মমর্যাদা সম্পন্ন হন, তাহলে একদিন সে জয়ী হবেই। জীবনে অনেক ঘাত প্রতিঘাত এসেছে তাকে অপেক্ষা করে ফুল্লরা জয়ী হয়েছে। তার স্বামীর কাছে ফিরে যাবার স্বপ্ন দেখেছেন। সে তার স্বামীর কাছে যাওয়ার ইচ্ছা পোষণ করেছে। আসলে সমকালীন সমাজে একজন নারীর অসহায়তা থেকে অতিক্রম করার জন্য একজন অবলম্বন দরকার। তাই সে বিয়ের পরে চলে এলেও আবার সে ব্রজেশ্বরের সাথে থাকার স্বপ্ন দেখেছে, চেয়েছে মায়ের অমত থাকা সত্ত্বেও। আসলে ফুল্লরার জীবনে নানা সংকট উপস্থিত হয়েছিল। আর্থিকঅবস্থা, সতীত্ব রক্ষা,ভবিষ্যতে অস্তিত্ব রক্ষা। এসব সামাজিক ব্যাধিকে অতিক্রম করে মর্যাদার সাথে বেঁচে থাকার কামনা করেছে। তাই ব্রজেশ্বর হাসপাতালে ভর্তি হলে ফুল্লরা বলেছে,-"মায়ের দিকে ছল ছল চোখে তাকিয়ে সিঁথিতে হাত চেপে ফুঁপিয়ে ওঠে ফুল্লরা, 'মারে খ্যাপা বাজবে তো?" [২] অর্থাৎ বা ফুল্লরা বারংবার ভেবেছে,একমাত্র শেষ অবলম্বন তার সেই পাগল স্বামী। সে আগামী দিনগুলি সম্মানের সহিত স্বামীর সাথে থাকতে চায়। গল্পাকার আলোচ্য গল্পে কেন্দ্র ফুল্লরা কেন্দ্র করে সমাজের যেমন নানা অসংগতিকে তুলে ধরেছেন, তেমনি সমাজে এক নারীর সতীত্ব কুলমর্যাদা রক্ষার বর্ণনা করে এক সুস্থ সামাজিক সমাজ গড়ার আহ্বান করেছেন।

অনিল ঘড়াই এর অন্যতম একটি গল্প হলো 'ফেরা'। এই গল্পে কেন্দ্রীয় চরিত্র হল এক বৃদ্ধা যার নাম পুঁটিবুড়ি।

পুঁটিবুড়ির জীবন,তার অনুভূতি,মানুষ সম্পর্কে অভিজ্ঞতা,নিজের মানুষের খারাপ আচরণ এবং তার সংসারের সদস্যদের প্রতি ভাবনার মধ্য দিয়ে সমকালীন গৃহস্থ পরিবারের সম্পত্তির জন্য বিবাদ ও জঘন্য আচরণের পরিচয় লক্ষ করা যায়। আলোচ্য গল্পে দেখা যায় পুঁটিবুড়ির বয়স যথেষ্ট হয়েছে। তার পুত্র মারা গেছে। নাতি ও নাত বৌ তার একমাত্র ভরসা। সমস্ত জমি ও বাস্তু পুঁটিবুড়ি নামে। নাতি অভয় আর নাতবৌ মায়া উঁকি বুড়ির সম্পত্তি নিজেরা লিখে নিতে চায়। কিন্তু বুড়ির প্রতি জঘন্য আচরণ করে এবং তার ফলে পুঁটিবুড়ির মনে অভয়,মায়ার প্রতি তীব্র অসন্তোষ ও ক্ষোভের কারণে বাড়ি ছেড়ে চলে যেতে চেয়েছে। কিন্তু অভয় ও মায়া সম্পত্তির লোভে পুঁটিবুড়িকে যেতে বাধা দিয়েছে। আর বুড়ির হাজার ক্ষোভ ও অসন্তোষ থাকা সত্ত্বেও মাটির টানে অন্য কোথাও যেতে পারেনি। বুড়ির উপর মায়ার অত্যাচারের বর্ণনা এরকম,-"তার শুধু একটাই অসুখ মায়া কেন তাকে ভালবাসলো না,নিজের করে নিল না। তার দোষটা কোথায়? নিজের পয়সায় বা বানানো নিজের বাথরুমে ঢুকতে দেয় না মায়া। তুমুল তর্কের ঝড় বইয়ে বলে, তুমি বুড়ি মানুষ বাইরে চলে যাও। যখন বাথরুম হয়নি তখন কোথায় যেতে?"[৩] কিন্তু এত নিষ্ঠুর আচরণের পরেও পুঁটিবুড়ি যেতে পারেনি। আসলে পুঁটিবুড়ির ভালোবাসা,মমত্ববোধের প্রকাশ পেয়েছে। তাই বাড়ি ছেড়ে চলে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েও যেতে পারেনি। "স্মৃতির টানে ভেজা ঘাসে পা রেখে পুঁটিবুড়ি আবার ফিরে এলো নিজের ঘরে। মায়া আর অভয়কে কাছে ডেকে বলল,ভেবেছিলাম আমি চলে যাব কিন্তু যাওয়া আর হলো না। তোমাদের ছানাপোনার মুখ না দেখে চলে গেলে স্বর্গে গিয়েও কি আমি সুখ পেতাম?"[৪] গল্পকার 'ফেরা' গল্পে আসলে পুঁটি বুড়ির মধ্য দিয়ে সমাজ পরিবার বন্ধনের সাথে আত্মিক সম্পর্ককে তুলে ধরতে চেয়েছে। মানুষের বন্ধনের ছবিকে দেখাতে চেয়েছে পুঁটিবুড়ির মধ্য দিয়ে মানুষের মনুষ্যত্ব ও দয়ালু এবং মহানুভবের পরিচয়কে তুলে ধরে মানুষের মধ্যেকার মনুষ্যত্বের জাগরণের চেষ্টা করেছেন।

গল্পাকার 'জিহ্বা' গল্পে একটি দুস্থ পরিবারের করুন অবস্থাকে তুলে ধরে সেই সমাজের দারিদ্র,করুন অবস্থা ও মানুষের মধ্যেকার মূল্যহীন,বিবেকহীন,অমানবিকতাবোধ ও মানুষরূপী নরপিশাচ,নারীকে সমাজে ভোগের বস্তু মনে করার জঘন্য প্রতিরূপ রূপে তুলে ধরেছেন। 'জিহ্বা গল্পের উল্লেখযোগ্য চরিত্র বেহুলা। বেহুলা বালতি কারখানাতে কাজ করে খুব অভাবের মধ্যে দিন জীবন যাপন করে। বেহুলা অবিবাহিত নারী। বাড়িতে মাকে নিয়ে থাকেন। বেহুলাকে একদিকে যেমন অভাবের সঙ্গে সংগ্রাম করতে হয় তেমনি নারীর ইজ্জতের সম্মান রক্ষার জন্য দৃঢ়ভাবে সংগ্রাম করতে হয়। এই দুই সংগ্রামের সাথে লড়তে লড়তে বেহুলার জীবন বিপন্ন হয়ে যায়। একবার লাট্টু নামে এক কিশোরের প্রনয়ের প্রস্তাব এলেও বেহুলা বিশ্বাস না করে প্রত্যাখ্যান করেছে। বেহুলা চেয়েছিল জীবন ধারণের অবলম্বন। তাই লাট্টু যখন ফুল দিয়ে প্রেম নিবেদন করেছে, তখন বেহুলা বলেছে,- "ফুলের চেয়ে ভাত আমার কাছে আরো বড় তোমার কি ক্ষমতা আছে আমাকে ভাত দেওয়ার।"[৫] লাট্টু জীবনধারণের আশ্বাস দিলেও বেহুলা বিশ্বাস করতে পারেনি। বিশ্বাস না করার কারণ আসলে সমাজে যেভাবে নারীকে ভোগের পণ্য হিসেবে ব্যবহার করে ছুঁড়ে ফেলে দেওয়া হয় সেই পরিস্থিতিতে বেহুলা কোন পুরুষকে বিশ্বাস করতে পারেনি। অপরদিকে মায়ের চিকিৎসার জন্য এক বিবাহিত দিদি অহল্যার কাছে দশ টাকা বেহুলা চেয়েছিল ধার হিসেবে। অহল্যা দিয়েছিল কিন্তু বারংবার সেই টাকা নেওয়ার জন্য বেহুলার কাছে দাবি করে। বেহুলার মা সে তো অহল্লারও মা। কিন্তু অহল্যার আচরণে অমানবিকতার হিংস্র রূপের ছবি ফুটে উঠেছে। যা বেহুলাকে হারিয়ে সমাজের স্বার্থপরতার হীন ছবি তুলে ধরা হয়েছে। বেহুলার পিতা সুধন্য দুস্থ ও গরিব। খাবারের সংস্থানের জন্য হাসপাতালের গেটে বসে থাকে। কারো উচ্ছিষ্ট খেয়ে বেঁচে থাকত একসময় খিদের টানে এক রোগীর খাবার চুরি করে ক্ষুধা নিবারণের চেষ্টা করে। রোগী সহ ভদ্রলোকদের অনভিপ্রেত আচরণে সুধন্য এ

পৃথিবীতে আর থাকতে চায় না মৃত্যু কামনা করেছ। সুধন্য এক সময় বলেছে,- "হ্যাঁ হ্যাঁ আমি দোষী আমার কলিজায় লাথি মেরে প্রাণ পাখিটারে উড়াইয়া দাও।"[৬] সুধন্যের এমন আচরণের জন্য শুধু কি সুধন্যই দায়ী না এমন অবস্থার জন্য প্রগতিশীল সমাজও দায়ী সেই প্রশ্নই তুলে দিয়েছে। বেহুলা তার বাবাকে বাড়িতে নিয়ে আসে, মা পার্বতীবুড়ি একা থাকলেও স্বামীকে দেখে বিরক্ত হয়। বেহুলার আশ্বাসে মা পার্বতী নিশ্চিন্ত। সুধন্য ছিলেন রেলের গ্যাং ম্যান। পুত্রের অবহেলায় মৃত্যুর পর আর সে ওই কাজে যাননি শোকের বশবর্তী হয়ে। বর্তমানে এই চরম দারিদ্র্যের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে বেহুলা একজন মেয়ে হয়েও ছেলের মত বাবা মাকে ভরণপোষণের দায়িত্ব নিয়েছে। বেহুলার জীবনেও আনন্দঘন শিহরণ সমস্ত সত্তা থাকলেও অপার্থিব উষ্ণ আলিঙ্গন সুখের ইচ্ছা থাকলেও শুধু মানসিক দৃঢ়তায় সংযমের কঠিন বাঁধে নিজেকে আটকে রেখেছিল। তার এই প্রতিজ্ঞা তার প্রবল আত্মবিশ্বাস এবং মনোবল এর পরিচয় দেয়। লাট্টু বারবার বেহুলার কাছে তার প্রকৃত ভালবাসার সম্ভাষণ করে গিয়েছে। লাট্টু বেহুলাকে বিয়ে করার বারংবার প্রস্তাব দিয়েছে কিন্তু বেহুলার সাহস হয়নি। মন চাইলেও লাট্টু বারবার বেহুলাকে তার ভালোবাসার পরীক্ষা দিয়েছে। লাট্টু বেহুলার উদ্দেশ্যে জানিয়েছে,-"আকাশের কাছে চাতক পাখি জল চাইলে আকাশ তার কথা রাখে, তুমি আকাশের চেয়েও বড়।"[৭] এবং বেহুলার মনে সাহস জুগিয়েছে লাট্টু।সে বলেছে,- "মনের জোরই মানুষের আসল শক্তি। সেই শক্তি তোমার আছে।"[৮] বেহুলার জীবনে নানা ভাঙ্গা গড়ার মধ্য দিয়ে যখন বলরাম নামে একজন পাত্র আসে। তখন স্বপ্নের একটা ঘর বাঁধার কল্পনা করেছিল মনের নিভৃতে। কিন্তু লাট্টু সহ পাড়ার যুবক বেহুলার কালো জিভের প্রসঙ্গ রটিয়ে কালামুখী, অপয়া বলে অপবাদ ছড়িয়ে দেয়। সেই অপবাদের আগুনে বেহুলা মনে মনে দগ্ধ হয় এবং নিজে নিজে ভাবে ভগবান সব সুখ সবাইকে দেয় না। বেহুলা সবশেষে ভেবেছে লাট্টুর কথা। লাট্টুর মুখ তার মনে পড়েছে, চোখে নেমে এসেছে অস্থিরতা,অনুভূতিময় কাঁপুনি। আর লাট্টুর কথা মনে পড়েছে। লাট্টু বলেছিল,- "যা তোমার আছে তা আমার নেই, যা দিনে নেই তা আজ রাতে,যা মাটিতে নেই তা থাকে পলিমাটিতে, ভাবতে ভাবতে পলি মাটির চেয়েও নরম আর নমনীয় সুন্দর হয়ে ওঠে তার আশ্চর্য অপরূপ শিল্প খচিত জিহ্বা।"[৯] এইভাবে গল্পকার আলোচ্য গল্পে বেহুলার স্বাদ ইচ্ছার মাধ্যমে সমাজের নগ্ন রূপের ছবি তুলে ধরেছেন।

গল্পাকারের অপর একটি অন্যতম গল্প হল 'পিন্ডি'। আলোচ্য গল্পের প্রধান চরিত্র দুলালী। দুলালীর স্বামীর সর্পাঘাতে মৃত্যু ও গ্রামের শোকের আদেশে আদেশ গয়ায় গিয়ে পিন্ডি দান করার জন্য পরামর্শ দেওয়া এবং শেষ পর্যন্ত মিনুর পিণ্ডিদানের জন্য গয়ায় যাওয়া স্থির করার কাহিনী নিয়ে গল্পটি রচিত। এই গল্পে দুলালীর জীবনে স্বামীর মৃত্যু,পুত্রের পাগলামি,শেষ সম্বল জমি নিয়ে নেওয়া এবং দুর্গার মত মিনুর আবির্ভাব দুলালীর বৌমা হওয়ার প্রস্তাব এবং স্বীকৃতি, যেন দুলালীর ছিন্ন বিচ্ছিন্ন ছন্নছাড়া জীবনে নতুন ভাবে বাঁচার আশার আলো লুকিয়েছে। দুলালীর স্বামী সদাশিব মারা যাওয়ার পর গ্রামের সব মানুষদের চাপ দেওয়া হয় পিণ্ডি দান করার জন্য গ্রামের শান্তিরক্ষার স্বার্থে। আলোচ্য গল্পে তার বর্ণনা এইরকম,- "সব শালিকের এক ডাক- আগে পিন্ডিদান করো। পিণ্ডি যে দেব, টাকা কোথায়? কেন ঘরের সামনের জমিটা বেচে দাও।"[১০] উদ্দেশ্য শুধু গ্রামের শান্তি স্থাপন ছিল না। ছলে বলে কৌশলে সেই সুযোগে সুফলের জমি হাতিয়ে নেওয়ার অভিপ্রায় প্রকাশ পেয়ে যায়। এই অবস্থায় মিনুর আবির্ভাব মিনুর সাহসী মনোভাব অদম্য ইচ্ছা এবং ভবিষ্যতে জীবনধারণের লক্ষ্যে দুলালীর একমাত্র পাগল পুত্র। দুঃখীর সাথে ঘর বাঁধতে চেয়েছে এবং দুলালী সম্মত হয়ে তাদের বিয়ে দিয়েছে। মিনু দুলালীর জীবনে এক আশীর্বাদ রূপে এসেছিল। একদিকে সামাজিক কুসংস্কার অন্যদিকে জ্ঞাতি স্বার্থপরতা, দুশ্চরিত্র মানুষের করালগ্রাস প্রভৃতি অশুভ দিকের চক্রান্তের ছবি যেমন পাওয়া যায়। তেমনি সেই সব অশুভ দিকের প্রভাব অতিক্রম করে মিনু, দুলালীর ও দুঃখীর জীবনে নতুন করে বাঁচার স্বপ্ন দেখানোর ছবি গল্পকার তুলে ধরেছেন। সেই ছবির দৃষ্টান্ত বর্ণনা এমন,- "রাতে ফুটফুট করে সজনে ফুল রঙের জ্যোৎস্না..... মিনুর তাতানো শ্বাস পড়ে ঘন ঘন। বালি

ওরা নির্জনতায় দুটো শরীর নৈবেদ্য সাজায় কচি কলাপাতার মত পবিত্র মনে।"[১১]

আর একটি অন্যতম গল্প হল 'উরাংগাড়া'। এখানে গল্পাকার সুবর্ণরেখা নদী ও তার শাখানদী উরাংগাড়ার প্রতীকে মানব মানবীর হাসি কান্না,আশা-আকাঙ্ক্ষা,প্রেম-ভালোবাসা,দুঃখ-কষ্ট ইত্যাদির এক প্রতিরূপ গড়ে তুলেছে। আলোচ্য গল্পের প্রধান চরিত্র স্নেহময়,সায়ন্তনী আর বুদনী। স্নেহময়ের সুবর্ণরেখা নদীর চারপাশের প্রাকৃতিক পরিবেশ খুব ভালো লাগে। তাই স্নেহময় সুযোগ পেলেই সুবর্ণরেখা নদীর পাড়ে যায়,তার মনোময় মধুর পরিবেশে নিজের অপূর্ব রূপ আস্বাদন করতে। কিন্তু আজকাল স্নেহময়ের সুবর্ণরেখা নদীতে খুব একটা যাওয়া হয়ে ওঠে না। কারণ হিসেবে গল্পকার দেখিয়েছেন স্নেহময়ের স্ত্রী সায়ন্তনী। গল্পাকার বলেছেন,-"স্নেহময় অফিস থেকে ফিরে এসে সায়ন্তনীর হাসি খুশি মুখ দেখে তখন সুবর্ণরেখার কথা বেমালুম ভুলে যায় সে।.....যার ঘরেতেই নদীবয়। সে কি কখনো নদীর কাছে যায়।"[১২] ভাকুয়া আদিবাসী বুড়ো। তার কথায় সুবর্ণরেখা নদী একটি রাক্ষুসে নদী। বর্ষার সময় নদীটি খুব ভয়ংকর রূপ ধারণ করে। অনেক মানুষের প্রাণ কেড়ে নেয়। ভাকুয়ার দ্বারা আলোচ্য গল্পে আদিবাসী সমাজের রূপের বর্ণনা দিয়েছেন। তাদের দেবতা পূজো-উৎসব,ঘর সংসারের বর্ণনাও পাওয়া যায়। এবং ভাকুয়ার সরল সততায়, ব্যবহারের পরিচয়ের মাধ্যমে আদিবাসী সমাজের সরল চিত্রকে তুলে ধরেছেন গল্পাকার। আদিবাসী দেবতা সিংবোংগার উল্লেখ পাওয়া যায়। ভাকুয়ার একমাত্র মেয়ে বুদনীর সাথে স্নেহময়ের পরিচয় করিয়ে দেন। বুদনীর সাথে পরিচয় হওয়ার পর স্নেহময় বুদনীর প্রতি আকৃষ্ট হন। গল্পকার বুদনীর বর্ণনা দিতে গিয়ে বলেছেন তার পাহাড়ের চেয়েও কঠিন শরীর। প্রস্ফুটিত কালো গোলাপের সৌন্দর্য। তাই স্নেহময়ের মনে খুব সহজেই স্থান নেয় বুধনি। কিন্তু সায়ন্তনীও কম নয়। সেও গ্রীক রমণীর মত সুন্দরী। স্নেহময়ের চোখে যেন সায়ন্তনী সুবর্ণরেখা নদী, আর বুধনি তার শাখানদী উরাংগাড়া। গল্পাকার উরাংগাড়া নদীর বর্ণনা দিতে গিয়ে বলেছেন,-"উরাংগাড়া নদীর ঢেউ আড়বাঁশির সুরের চেয়েও মিহি,মিঠে।"[১৩] স্নেহময়ের চোখে সায়ন্তনী চন্দ্রমল্লিকার শরীর। আর বুদনী কুন্দ ফুলের গন্ধ। স্নেহময়ের বুদনীর পারস্পরিক প্রেম তাদেরকে এক অনন্য দৃষ্টান্তে পৌঁছে দেয়। স্নেহময় বুদনীকে ঘরে রাখতে চাইলেও সায়ন্তনীর কড়া নজরে স্নেহময় বুদনীকে কাছে রাখতে পারেনি বা তার মনের অনুভূতি প্রকাশ করতে পারেনি। পরস্পর নিজেরা ক্ষতবিক্ষত হয়েছে। সায়ন্তনী একবার সুবর্ণরেখা দর্শন করতে এসে একটুও ভয় পায়নি। সে বলেছে,- "ভাষা ভাষা চোখের কুচকুচে মণি নাচিয়ে বলল জীবনটাই তো চোরাবালি চোরা স্রোতের উপর দাঁড়িয়ে যে কোন সময় ডুবে যেতে কিংবা ভেসে যেতে পারে।"[১৪] এখান থেকে বাস্তুহারা ছবি স্পষ্ট হয়। শেষ পর্যন্ত স্নেহময় দুটি নারীকেই একই মনে স্থান দেয়। সায়ন্তনীও বধুনিকে মেনে নেয় বোনের মত করে। এ যেন সুবর্ণরেখা নদী ও উরাংগাড়া শাখানদীর মিলিত রূপ। আলোচ্য গল্পে গল্পকার স্নেহময়,সায়ন্তনী ও বুদনীর প্রেমের মধ্য দিয়ে সুবর্ণরেখা, উরাংগাড়া শাখা নদীর মিলিত রূপের ছবি তুলে ধরেছেন। সুতরাং গল্পাকার দুইটি নদীর বর্ণনার মাধ্যমে মানব মানবীর প্রেম,অনুভূতি,আবেগ সহৃদয়তাকে সুন্দরভাবে তুলে ধরেছেন।

Reference:

1. ঘড়াই, অনিল,'সেরা পঞ্চাশটি গল্প', পৃষ্ঠা -২০
2. ঘড়াই, অনিল, 'সেরা পঞ্চাশটি গল্প', পৃষ্ঠা -৩৩
3. ঘড়াই, অনিল, 'সেরা পঞ্চাশটি গল্প', পৃষ্ঠা -৩৬
4. ঘড়াই, অনিল, 'সেরা পঞ্চাশটি গল্প', পৃষ্ঠা -৩৮
5. ঘড়াই, অনিল, 'সেরা পঞ্চাশটি গল্প', পৃষ্ঠা -৪০

6. ঘড়াই, অনিল, ‘সেরা পঞ্চাশটি গল্প’, পৃষ্ঠা -৪৪
7. ঘড়াই, অনিল, ‘সেরা পঞ্চাশটি গল্প’, -৪৯
8. ঘড়াই, অনিল, ‘সেরা পঞ্চাশটি গল্প’, পৃষ্ঠা -৪৯
9. ঘড়াই, অনিল, ‘সেরা পঞ্চাশটি গল্প’, পৃষ্ঠা -৫১
10. ঘড়াই, অনিল, ‘সেরা পঞ্চাশটি গল্প’, পৃষ্ঠা -৫৩
11. ঘড়াই, অনিল, ‘সেরা পঞ্চাশটি গল্প’, পৃষ্ঠা -৫৫
12. ঘড়াই, অনিল, ‘সেরা পঞ্চাশটি গল্প’, পৃষ্ঠা -৯১
13. ঘড়াই, অনিল, ‘সেরা পঞ্চাশটি গল্প’, পৃষ্ঠা -৯৫
14. ঘড়াই, অনিল, ‘সেরা পঞ্চাশটি গল্প’, পৃষ্ঠা -১০০

Bibliography:

আকর গ্রন্থ

1. ঘড়াই, অনিল, ‘সেরা পঞ্চাশটি গল্প’, ‘দেজ পাবলিশিং’, প্রথম প্রকাশ মে ২০১৪, কলকাতা ৭০০০৭৩

সহায়ক গ্রন্থ

2. চট্টোপাধ্যায়, কুন্তল, 'সাহিত্যের রূপরীতি ও অন্যান্য প্রসঙ্গ', 'রত্নাবলী’, প্রথম প্রকাশ শ্রাবন ১৪০২, কলকাতা ৭০০০০৯
3. ড. চট্টোপাধ্যায়, পার্থ, 'বাংলা সাহিত্য পরিচয়', 'তুলসী প্রকাশনী’, প্রথম প্রকাশ ২৬ আগস্ট ১৯৯৯, কলকাতা ৭০০০০৯
4. মজুমদার,উজ্জ্বল কুমার, 'পঞ্চাশের দশকের কথাকার','প্রজ্ঞাবিকাশ', প্রথম প্রকাশ বইমেলা ১৯৯৮, কলকাতা ৭০০০৩৭
5. মুখোপাধ্যায়,অরুণ কুমার, 'কালের প্রতিমা', ‘দেজ পাবলিশিং’, প্রথম প্রকাশ এপ্রিল ১৯৭৪, কলকাতা ৭০০০৭৩